বুড়িগঙ্গা

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

বিষয় কোড : ০০৫

নির্ধারিত সময় : ৪ ঘণ্টা, পূর্ণমান : ২০০

BCS CONFIDENCE — বেলাল আহমেদ রাজু

৪৭তম লিখিত মডেল টেস্ট-৩

[দ্রষ্টব্য : বাংলা ভাষায় উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

নম্বর

১. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন :

**** নির্দেশনা :**

i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।
ii. প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে সর্বোচ্চ ৬৫ - ৭০% নাম্বার দিতে পারেন, সর্বনিম্ন ৩০ - ৪০%, এভারেজ নম্বর ৪৫ - ৫৫% ।
iii. প্রশ্নের উত্তরে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলি সঠিকভাবে লিখলে ভাল নম্বর পাবে।
iv. প্রশ্নের উত্তরে ভুল লিখলে তা সংশোধন করে দিবেন প্লিজ।
v. প্রশ্নের উত্তরে প্রার্থী গ্রহণযোগ্য সোর্সসহ ডেটা দিলে ভাল নাম্বার পাবেন। সেক্ষেত্রে, ডেটাগুলি যাচাই করে নিবেন।
vi. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মানচিত্র বা চার্ট বা গ্রাফ দেয়ার কথা বলে দিবেন প্লিজ।
vii. প্রতিটি প্রশ্নে ২/৩টি মন্তব্য লিখে দিবেন।

ক. **নরগোষ্ঠী (Race) ও জাতি (Nation) কী? "বাঙ্গালী একটি শংকর জাতি"- ব্যাখ্যা করুন।** ১০

নমুনা উত্তর :

নরগোষ্ঠী (Race) : নরগোষ্ঠী হলো মানুষের এমন এক বৃহত্তর জীববৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী, যার সদস্যদের মধ্যে শারীরিক বৈশিষ্ট্য—যেমন চামড়ার রং, চুলের গঠন, নাক-চোখের আকৃতি, শারীরিক বর্ণন—ইত্যাদিতে কিছু সাধারণ মিল থাকে। ইতিহাসে ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ু, খাদ্যাভ্যাস ও বিবর্তনগত প্রভাবের কারণে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। নরগোষ্ঠী মূলত জৈব-শারীরিক পরিচয়ের ভিত্তিতে মানবগোষ্ঠী বিভাজন।

জাতি (Nation) : জাতি হলো এমন একটি বৃহত্তর মানবসমষ্টি, যারা একই ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, ভূখণ্ড ও জাতীয় চেতনায় যুক্ত থাকে। জাতি জৈবিক নয়; এটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও মানসিক একতা থেকে গঠিত। অর্থাৎ—একটি জাতি হলো একক জাতীয় সত্তার অনুভূতি-বহনকারী জনগোষ্ঠী।

"বাঙ্গালী একটি শংকর জাতি"

"বাঙ্গালী একটি শংকর জাতি" কথাটির অর্থ হলো—বাঙালির জাতিগত গঠন কোনো একক নরগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে নানা নরগোষ্ঠী, জনগোষ্ঠী ও জাতিগত উপাদানের সংমিশ্রণে বাঙালি গঠিত হয়েছে। এর কারণসমূহ নিম্নরূপ —

প্রাচীন অস্ট্রিক জনগোষ্ঠী : বঙ্গ অঞ্চলের প্রাচীনতম বাসিন্দা; বাঙালির গঠনমূলের একটি অংশ।

দ্রাবিড় উপাদান : দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বাঙালির দেহগঠন ও ভাষায় দেখা যায়।

আর্য উপাদান : খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে আগত আর্যরা ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক কাঠামোয় গভীর প্রভাব ফেলেছে।

মঙ্গোলয়েড প্রভাব : তিব্বত–বর্মা ও মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মানুষের আগমনও বাঙালি জাতির শারীরিক বৈশিষ্ট্য বৈচিত্রময় করেছে।

আরব, পারসিক ও তুর্কি উপাদান : মধ্যযুগে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক আগমনের মাধ্যমে নতুন রক্তরেখা যুক্ত হয়।

ইউরোপীয় প্রভাব : পর্তুগিজ, ফরাসি ও ইংরেজদের সাথে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায়ও কিছু জাতিগত সংমিশ্রণ হয়েছে।

বাঙালি জনগোষ্ঠীর শারীরিক বর্ণ, চুলের ধরন, নাক-চোখের গঠন, উচ্চতা এবং সাংস্কৃতিক আচরণে বহুমাত্রিক বৈচিত্র দেখা যায়। এই জনমিশ্রণের ফলেই বাঙালি জাতি এক শংকর বা সংকর জাতি, অর্থাৎ বহু নরগোষ্ঠীর মিলনে গঠিত একটি জাতিগত সত্তা।

খ. **বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ উল্লেখ করুন।** ১০

নমুনা উত্তর :

সুনীল অর্থনীতি বলতে সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ও পরিবেশবান্ধব ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করার পদ্ধতিকে বোঝায়। বাংলাদেশ ২০১২ ও ২০১৪ সালের সমুদ্রবিজয়ের মাধ্যমে প্রায় ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার সামুদ্রিক অঞ্চল অর্জন করে, যা দেশের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এই বিশাল জলসীমা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কাঠামোয় সুনীল অর্থনীতিকে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভে পরিণত করতে পারে।

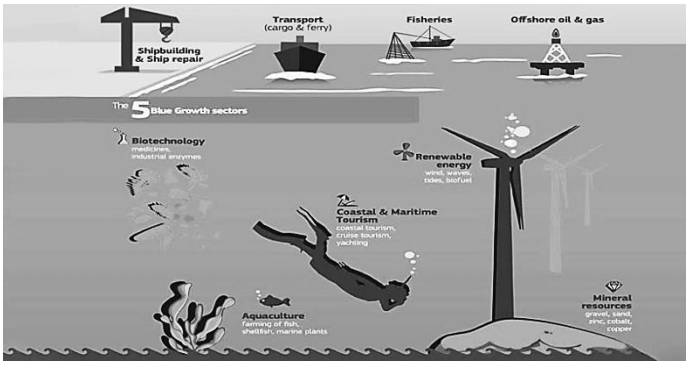

বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা :

১. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের বিশাল ভাণ্ডার : বঙ্গোপসাগরে প্রায় ৫০০ প্রজাতির মাছ, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি ও বহু মূল্যবান সামুদ্রিক জীব রয়েছে। বর্তমান আহরণ সম্ভাবনার তুলনায় খুবই কম। আধুনিক ট্রলার, গভীর সমুদ্র আহরণ প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করলে এই খাত জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

২. অফশোর গ্যাস ও তেলের সম্ভাবনা : সমুদ্রসীমায় ২৬টি গ্যাস ব্লকে তেল-গ্যাস মজুদের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সফল অনুসন্ধান নিশ্চিত হলে জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং আমদানি ব্যয় অনেক কমে যাবে।

৩. মূল্যবান খনিজ সম্পদ আহরণের সুযোগ : সমুদ্রতলের বালিতে জিরকন, ইলমেনাইট, মোনাজাইট, রুটাইলসহ বহু মূল্যবান খনিজ রয়েছে। এগুলো রপ্তানির পাশাপাশি শিল্পকারখানায় ব্যবহার করা গেলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বাড়বে।

৪. নৌপরিবহন ও বন্দর উন্নয়ন : বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রায় ৯০% সমুদ্রপথে সম্পন্ন হয়। চট্টগ্রাম ও পায়রা বন্দরের আধুনিকায়ন দেশের আমদানি-রপ্তানি খরচ কমাবে এবং বাংলাদেশকে আঞ্চলিক ট্রানজিট হাবে পরিণত করতে পারে।

৫. উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পর্যটনের বিশাল সম্ভাবনা : কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, কুয়াকাটা, সোনাদিয়া—এসব এলাকায় ইকো-ট্যুরিজম, মেরিন ড্রাইভ, ওয়াটার স্পোর্টস এবং ক্রুজ ট্যুরিজম বিকশিত হলে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং বিদেশি পর্যটক আকর্ষণ করা সম্ভব হবে।

৬. শিপবিল্ডিং ও শিপ রিসাইক্লিং শিল্পের সম্প্রসারণ : বাংলাদেশ বিশ্বে শিপ রিসাইক্লিংয়ের বড় কেন্দ্রগুলোর একটি। একই সঙ্গে জাহাজ নির্মাণ শিল্প দ্রুত উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে। সরকারি প্রণোদনা, প্রযুক্তি ও নিরাপত্তা উন্নত হলে এই দুটি শিল্প বিশ্ববাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক হবে।

৭. নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন : উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার-ভাটা শক্তি, তরঙ্গ শক্তি এবং অফশোর উইন্ড এনার্জি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে, যা ভবিষ্যতে জ্বালানি সংকট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৮. সামুদ্রিক জৈবসম্পদ ও বায়োটেকনোলজি : সমুদ্রে থাকা শৈবাল, স্পঞ্জ, সামুদ্রিক জীবাণু থেকে ওষুধ, কসমেটিকস ও বায়োটেক পণ্য উৎপাদন সম্ভব। বৈজ্ঞানিক গবেষণা বাড়ালে এ খাত নতুন শিল্পখাতে রূপ নিতে পারে।

বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ:

১. দক্ষ মানবসম্পদ ও প্রযুক্তির ঘাটতি : গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা, তেল-গ্যাস উত্তোলন বা বায়োটেকনোলজি খাতে বিশেষায়িত দক্ষ জনবল কম। আধুনিক ট্রলার, জরিপযান, মেরিন ল্যাবরেটরি—এসব সরঞ্জামেরও ঘাটতি রয়েছে।

২. সমন্বিত নীতিমালা ও পরিকল্পনার অভাব : ব্লু–ইকোনমি বাস্তবায়নে নৌপরিবহন, মৎস্য, জ্বালানি, পরিবেশসহ বহু মন্ত্রণালয় জড়িত। কার্যকর সমন্বয় না থাকায় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জটিলতা তৈরি হয়।

৩. সমুদ্র নিরাপত্তা ও নজরদারির সীমাবদ্ধতা : অবৈধ মাছ ধরা, বিদেশি জাহাজের অনুপ্রবেশ, জলদস্যুতা ও চোরাচালান কার্যক্রম এখনো বড় হুমকি। কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনীর সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি।

৪. পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব : সমুদ্রে প্লাস্টিক, তেলবর্জ্য, জাহাজ ভাঙা শিল্পের দূষণ সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঘূর্ণিঝড়ের ঘনত্বও সুনীল অর্থনীতির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

৫. অপর্যাপ্ত গবেষণা ও তথ্যের অভাব : সমুদ্রসীমায় পূর্ণাঙ্গ হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ হয়নি। তথ্যের অভাবে পরিকল্পনা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পায় না।

৬. পর্যাপ্ত বিনিয়োগ আকর্ষণে সমস্যা : উচ্চমূল্যের প্রযুক্তি ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বড় বিনিয়োগ প্রয়োজন। নীতিগত অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ কম।

বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতি দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, জ্বালানি নিরাপত্তা ও শিল্পায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হতে পারে। তবে এর জন্য প্রয়োজন হবে—সমন্বিত সামুদ্রিক নীতি, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, পরিবেশ সংরক্ষণ, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম। পরিকল্পিত উদ্যোগের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর-নির্ভর সুনীল অর্থনীতি বাংলাদেশকে একটি টেকসই ও সমৃদ্ধ অর্থনীতির দিকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

২. **বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন গণযুদ্ধ বলা হয়– ব্যাখ্যা করুন।** ২০

নমুনা উত্তর : পূর্ববাংলার জনগণ দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক অধিকারহীনতা, বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক নীতি ও সাংস্কৃতিক দমনের শিকার হয়ে আসছিল। প্রশাসন, বিনিয়োগ, বাণিজ্য, সামরিক ও শিক্ষা—প্রতিটি খাতে বৈষম্য তাদের মনে ক্ষোভ, বঞ্চনা ও অপমানের গভীর বোধ তৈরি করে। এই বঞ্চনার অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে ব্যাপক জাতীয় চেতনায় রূপ নেয়, যা স্বাধীনতার দাবিকে সর্বস্তরের জনগণের আকাঙ্ক্ষায় পরিণত করে। ফলে এটি কোনো দল বা গোষ্ঠীর সীমিত আন্দোলন না হয়ে হয়ে ওঠে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের ভিত্তি।

- পূর্ববাংলা জাতীয় বাজেট থেকে পেত মাত্র ২৫%
- বৈদেশিক আয়ের ভাগ পেত মাত্র ৩০%
- পশ্চিম পাকিস্তান পেত মোট শিল্প বিনিয়োগের ৭০%
- মাথাপিছু আয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় ৪০% কম
- এই বৈষম্যই জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য সর্বজনীন চেতনাকে গড়ে তোলে।

২. ২৫ মার্চের গণহত্যা সর্বজনীন প্রতিরোধের সূচনা : ২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বিচার গণহত্যা চালায়। বিশ্ববিদ্যালয়, পুলিশ লাইন, ব্যারাক, গ্রাম-শহর—সব জায়গায় শিশু, নারী, ছাত্র, শিক্ষক, পুলিশসহ সাধারণ মানুষের উপর ভয়াবহ আক্রমণ করা হয়। এই নৃশংসতা সমগ্র জাতিকে বুঝিয়ে দেয় যে জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র পথ হলো সশস্ত্র প্রতিরোধ। তাই মুহূর্তের মধ্যেই এটি ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকে জাতীয় প্রতিরোধে রূপ নেয়।

- ঢাকায় প্রথম রাতে নিহত ৭,০০০–১০,০০০ মানুষ (আন্তর্জাতিক রিপোর্ট)
- রাজারবাগ পুলিশ লাইন প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র হত্যাকাণ্ড বিশ্বব্যাপী খবর হয়
- গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে দেশজুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ শুরু হয়।

৩. সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ : মুক্তিযুদ্ধ শুধুমাত্র প্রশিক্ষিত যোদ্ধাদের যুদ্ধ ছিল না—এটি ছিল কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবী, দিনমজুর থেকে শুরু করে গ্রামীণ সাধারণ মানুষের সম্মিলিত যুদ্ধ। কেউ অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে নামে, কেউ তথ্য ও রসদের যোগান দেয়, কেউ আশ্রয় দেয়, আবার কেউ গুপ্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই সার্বিক অংশগ্রহণই যুদ্ধকে প্রকৃত গণযুদ্ধে পরিণত করে।

- মোট মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণকারী—প্রায় ১০ লাখ
- প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা—২ লাখ+
- গ্রামবাসীর রসদ-সহায়তায় যুক্ত—১০–১২ লাখ মানুষ
- এই ব্যাপক অংশগ্রহণ যুদ্ধকে সর্বজনীন করে তোলে।

৪. নারীদের অসাধারণ ভূমিকা : নারীরা চিকিৎসা, গুপ্তবার্তা আদান-প্রদান, যোদ্ধাদের আশ্রয়, খাদ্য সরবরাহ ও সরাসরি যুদ্ধ—প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। যুদ্ধকালীন সব দুঃসহ পরিস্থিতি সত্ত্বেও তাদের অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে মুক্তিযুদ্ধ কেবল পুরুষের নয়, বরং পরিবার ও সমাজের সামগ্রিক সংগ্রাম।

- নির্যাতিত নারী: ২–৪ লাখ (জাতিসংঘ ও গবেষণা রিপোর্ট)
- সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নারী—১,০০০+
- চিকিৎসা, পরিবহন, বার্তা আদান-প্রদান: লক্ষাধিক নারী
- নারীদের ত্যাগ যুদ্ধকে আরও মানবিক ও সর্বজনীন করে।

৫. ছাত্রসমাজের নেতৃত্ব ও আত্মনিবেদন : ১৯৬০-এর দশকের গণ-আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ পর্যন্ত ছাত্রসমাজ ছিল সর্বাধিক সংগঠিত ও সচেতন একটি শক্তি। তারা মুক্তিযুদ্ধে সামরিক, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক—সব ক্ষেত্রেই কার্যকর নেতৃত্ব দেয়। তরুণদের উৎসাহ ও উৎসর্গ যুদ্ধকে দ্রুত ছড়িয়ে দেয়।

- মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ৬৫% ছিল ছাত্র
- ১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থানে ২০০+ ছাত্র কমিটি সক্রিয় ছিল
- ছাত্রসমাজ যুদ্ধকে তরুণদের গণ-অভিযানে রূপ দেয়।

৬. গ্রামবাসীর সর্বাত্মক সহযোগিতা : যুদ্ধের কৌশলগত ভিত্তি ছিল গ্রাম। গ্রামবাসী খাদ্য, পথনির্দেশ, আশ্রয়, অস্ত্র লুকানো, শত্রুর খবর সংগ্রহ—সব ধরনের সহায়তা প্রদান করে। তারা অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি প্রতিরোধও গড়ে তোলে। এভাবে গ্রামই মুক্তিযুদ্ধের প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হয়।

- যুদ্ধের ৮০% সংঘটিত হয় গ্রামীণ এলাকায়
- দেশজুড়ে ৫০+ মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়
- গ্রামবাসীর সহায়তায় যুক্ত ছিল লক্ষাধিক মানুষ
- গ্রামবাসীর অংশগ্রহণ যুদ্ধকে টিকিয়ে রাখে।

৭. শরণার্থীদের নৈতিক ভূমিকা : যুদ্ধের সহিংসতায় উদ্বাস্তু হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারত চলে যায়। তাদের মানবিক দুর্দশা, নির্যাতনের গল্প ও বেদনাদায়ক বাস্তবতা আন্তর্জাতিক মহলে পাকিস্তানি বর্বরতার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে। এতে বাংলাদেশের প্রতি বৈশ্বিক সহমর্মিতা ও সমর্থন বাড়ে।

- শরণার্থী: প্রায় ১ কোটি
- ভারত সরকারের ব্যয়: ₹৪০০ কোটি (১৯৭১ সালের মূল্য)
- শরণার্থীদের কষ্ট বিশ্বে বাংলাদেশের যুদ্ধকে ন্যায়সঙ্গত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

৮. সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অনুপ্রেরণা : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যুদ্ধের সময় সাংস্কৃতিক সংগ্রামের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। গান, কবিতা, নাটক, সংবাদ ও ভাষণ মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ জনগণকে অনুপ্রাণিত করে। এটি যুদ্ধকে মানসিক ও নৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে।

- স্বাধীন বাংলা বেতারে প্রচারিত গান—৩৬৭+
- "জয় বাংলা" হয়ে ওঠে যুদ্ধের জাতীয় স্লোগান
- সংস্কৃতি যুদ্ধকে জাতীয় আবেগে রূপ দেয়।

৯. সর্বত্র প্রতিরোধ বাহিনী ও ঐক্য : বিভিন্ন এলাকায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে ওঠে—ছাত্র, গ্রামবাসী, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, পুলিশ, আনসার সবাই মিলে এসব বাহিনী পরিচালনা করে। এই স্থানীয় প্রতিরোধই দেশজুড়ে যুদ্ধকে বিস্তৃত করে।

- সারা দেশে ১১টি সেক্টর, ৩টি সাব-সেক্টর
- হাজারো স্থানীয় প্রতিরোধ বাহিনী
- এসব বাহিনী যুদ্ধকে জাতীয় গণপ্রতিরোধে পরিণত করে।

১০. আন্তর্জাতিক সমর্থনে জনগণের ভূমিকা : বাংলাদেশের জনগণের দুর্দশা, শরণার্থীর কষ্ট ও পাকিস্তানি বর্বরতার খবর বিশ্বমিডিয়ায় আলোড়ন তোলে। এর ফলে বিভিন্ন দেশ, মানবাধিকার সংগঠন ও সাংবাদিকরা বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়ায়। যুদ্ধ আন্তর্জাতিক বৈধতা পায় মূলত জনগণের ভোগান্তির কারণেই।

- ২৩+ দেশ যুদ্ধের শেষদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সমর্থন জানায়
- যুক্তরাষ্ট্রের "Blood Telegram" পাকিস্তানি বর্বরতা প্রকাশ করে
- আন্তর্জাতিক সমর্থন মূলত জনগণের দুর্ভোগের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

সব দিক বিবেচনায় মুক্তিযুদ্ধ ছিল নিছক সামরিক লড়াই নয়, ছিল একটি সর্বস্তরের মানুষের গণ-অভ্যুত্থান। বৈষম্যের বঞ্চনা, গণহত্যার বিরুদ্ধে ক্ষোভ, ছাত্র-তরুণের নেতৃত্ব, নারী ও গ্রামের মানুষের সহায়তা, শরণার্থীদের নিদারুণ অবস্থার আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া—সবকিছু মিলেই যুদ্ধকে পরিণত করে জাতির অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষার সর্বজনীন লড়াইয়ে। প্রায় ১০ লাখ যোদ্ধা, ১ কোটি শরণার্থী ও লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত মানুষের অবদানই প্রমাণ করে—বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল প্রকৃত অর্থে এক ঐতিহাসিক গণযুদ্ধ।

৩. জুলাই সনদ কী এবং এর উদ্দেশ্য কী? জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ও চ্যালেঞ্জগুলি আলোচনা করুন। ২০

নমুনা উত্তর :

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থান এক বিশেষ মাইলফলক। ছাত্র, শ্রমিক ও সাধারণ জনগণের যৌথ আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে তৎকালীন কর্তৃত্ববাদী ও ফ্যাসিবাদী সরকার পতিত হয়, জাতীয় সংসদ ভেঙে দেওয়া হয় এবং ৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। এই ঘটনা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সংবিধান সংস্কারের জন্য একটি নতুন সুযোগ তৈরি করে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সংবিধান সংস্কার, নির্বাচন প্রক্রিয়া, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন এবং দুর্নীতি দমন ব্যবস্থায় সংস্কার আনার জন্য ৬টি বিশেষ কমিশন গঠন করে। এগুলো থেকে প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) ২০২৫ প্রণয়ন করে। মূল লক্ষ্য ছিল দেশের সুশাসন, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

তবে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরুতেই বিতর্কের মুখে পড়ে। রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত, নোট অব ডিসেন্ট, এবং কমিশনের প্রস্তাবিত স্বয়ংক্রিয় সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অনেকেই বিতর্কিত হিসেবে দেখেছেন। বিশেষ করে বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় নাগরিক পার্টি বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছে।

জুলাই জাতীয় সনদের মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো : গণতন্ত্র ও সুশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা: সংবিধান ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংস্কার আনা যাতে সরকারী কার্যক্রম স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ হয়।

সংবিধান সংস্কারের কাঠামো নির্ধারণ : সংসদ ও সংবিধান সংস্কার পরিষদ মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী সংস্কার নিশ্চিত করা।

রাজনৈতিক ঐক্য ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি : ৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা।

জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ : সংবিধান সংস্কারের অনুমোদন গণভোটের মাধ্যমে সংগ্রহ করা।

সুশাসন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা, নির্বাচন প্রক্রিয়া, বিচার প্রশাসন এবং জনপ্রশাসনে সংস্কার কার্যকর করা।
জুলাই সনদ সরল নীতি এবং কাঠামোগত সংস্কার উভয়ই লক্ষ্য করে। এটি সংসদ, সংবিধান সংস্কার পরিষদ ও উচ্চকক্ষের কাঠামোগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করে।
জুলাই সনদ বাস্তবায়ন একটি ধাপে ধাপে জটিল প্রক্রিয়া, যা মূলত নিম্নলিখিত ধাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে:
গণভোট আয়োজন : জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কারের অনুমোদন সংগ্রহ করা হবে।
গণভোটে ভোটারদের মূল প্রশ্ন থাকবে : "আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং তফসিল-১–এ অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করেন?"
এতে সংবিধান–সংক্রান্ত ৪৮টি প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
ভোটারদের ভোট গোপনে নেওয়া হবে এবং নির্বাচন কমিশন তত্ত্বাবধান করবে।
দুটি বিকল্প প্রস্তাব : ভোটাররা খসড়া বিল অনুমোদন করবেন; সংবিধান সংস্কার পরিষদ ২৭০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ না করলে বিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে।
ভোটাররা শুধু প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করবেন; ২৭০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ না হলে কী হবে তা উল্লেখ নেই।
সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন : গণভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ 'হ্যাঁ' হলে পরবর্তী সংসদ নির্বাচনের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংবিধান সংস্কার পরিষদে সদস্য হবেন।
পরিষদ ২৭০ দিনের মধ্যে সংবিধান সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করবে।
সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত এমপিরা দুই শপথ গ্রহণ করবেন:
সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য : পরিষদের কার্যক্রমে কোরাম ন্যূনতম ৬০ সদস্য এবং সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট প্রয়োজন।
উচ্চকক্ষ গঠন : সংবিধান সংস্কার সম্পন্ন হওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (PR) পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ গঠন করা হবে। উচ্চকক্ষের মেয়াদ নিম্নকক্ষের মেয়াদের শেষ পর্যন্ত চলবে।
স্বয়ংক্রিয় সংবিধান সংশোধনী : সংবিধান সংস্কার পরিষদ ২৭০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ না করলে খসড়া বিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে। এতে আর কোনো অনুমোদন বা ভোটের প্রয়োজন থাকবে না। এটি সংসদীয় সার্বভৌমত্ব ও সাধারণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বাইরে চলে যায়।
বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও বিতর্ক : রাজনৈতিক বিভাজন ও নোট অব ডিসেন্ট
- বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ বিভিন্ন দল ভিন্নমত পোষণ করেছে।
- কমিশনের সুপারিশে নোট অব ডিসেন্ট অন্তর্ভুক্ত হয়নি।
- ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাবে ৬১টিতে নোট অব ডিসেন্ট রয়েছে।
- স্বল্প সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলো সরল সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে প্রস্তাব পরিবর্তন করতে পারবে।

জটিল গণভোট প্রশ্ন : ৪৮টি প্রস্তাব একসঙ্গে অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ভোটার যদি কিছু সমর্থন ও কিছু প্রত্যাখ্যান করেন → স্পষ্ট হ্যাঁ/না ভোট দেওয়া কঠিন। কম ভোটার উপস্থিতি, বিভ্রান্তি বা ভুল সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা বেশি।
স্বয়ংক্রিয় বিল ও সময়সীমা ঝুঁকি : ২৭০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ না হলে বিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে। সংসদ সদস্যরা সময়ের চাপের কারণে গভীরভাবে বিবেচনা না করে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন। অসম্পূর্ণ বা অগ্রহণযোগ্য খসড়া বিল সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
আইনি ও সংবিধানিক ঝুঁকি :
- স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া সংবিধান সম্মত কি না তা প্রশ্নবিদ্ধ।
- আদালত, রিট ও স্থগিতাদেশের জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।
- প্রক্রিয়ায় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দায়ী থাকবে না।

প্রশাসনিক ও গুণগত চ্যালেঞ্জ : প্রস্তাবিত স্বয়ংক্রিয় বিধান গুণগত মানের চেয়ে সময়সীমা বেশি গুরুত্ব দেয়। গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে অপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ সংস্কার গ্রহণ হতে পারে। উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পুনর্বিবেচনা সংক্রান্ত অস্পষ্টতা সমস্যার সৃষ্টি করে।
আন্তর্জাতিক তুলনা ও প্রাসঙ্গিকতা : বিশ্বের স্থিতিশীল গণতন্ত্রে (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, কানাডা, জার্মানি) সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদ বা কংগ্রেসের স্পষ্ট ভোট ও সমর্থন আবশ্যক। স্বয়ংক্রিয় বিলের ব্যবস্থা অবিশ্বস্ত ও বিরল। এটি সংসদীয় সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ন করতে পারে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে।
রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব : স্বয়ংক্রিয় বিধান, জটিল গণভোট এবং নোট অব ডিসেন্ট বাদ দেয়ার কারণে রাজনৈতিক বিভাজন ও অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়। ভোটারদের জন্য জটিল প্যাকেজ ভোট প্রয়োগ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। যদি সংসদ ২৭০ দিনের মধ্যে কার্যকর সংস্কার না আনে → অসম্পূর্ণ সংস্কার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে। দীর্ঘমেয়াদে, এটি রাষ্ট্র পরিচালনায় অচলাবস্থা, আইনি জটিলতা এবং সুশাসনের ঘাটতি তৈরি করতে পারে।
জুলাই জাতীয় সনদ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবর্তনা। এটি সংবিধান সংস্কার, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সুশাসন, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে। তবে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া রাজনৈতিক বিভাজন, জটিল গণভোট প্রশ্ন, স্বয়ংক্রিয় বিল, নোট অব ডিসেন্টের অবমূল্যায়ন এবং সময়সীমা চাপের কারণে বিতর্কিত ও ঝুঁকিপূর্ণ। সফল বাস্তবায়ন হলে: বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে। ব্যর্থ বা অসম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হলে: রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকট, রাষ্ট্র পরিচালনায় জটিলতা এবং আইনি অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।

৪. **'আইন' ও 'অধ্যাদেশ' এর মধ্যে পার্থক্য কী? গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলি সম্পর্কে লিখুন।** ২০

নমুনা উত্তর :

আইন : আইন হলো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়ন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান জাতীয় সংসদে প্রণীত এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের মাধ্যমে কার্যকর বিধি। এটি সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী হয়। সংসদে একটি বিল উপস্থাপন করে উভয় কক্ষে অনুমোদনের পর রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দিলে তা আইন হিসেবে বলবৎ হয়। আইন সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা, নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। সংবিধানের ধারা 65 ও 118 অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তন করা হয়।

অধ্যাদেশ : অধ্যাদেশ হলো রাষ্ট্রপতি বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জরুরি বা অস্থায়ী নির্দেশ, যা সংসদ অনুমোদনের আগে প্রাথমিকভাবে কার্যকর হয়। সাধারণত ৬০–৯০ দিনের মধ্যে সংসদ অনুমোদন না দিলে এটি অকার্যকর হয়ে যায়। সংবিধানের ধারা 93 অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতা প্রদান করে। এটি সাধারণত জরুরি পরিস্থিতি, অস্থায়ী আইন প্রয়োজন বা প্রশাসনিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য ব্যবহৃত হয়। অধ্যাদেশ সংসদে অনুমোদিত হলে স্থায়ী আইন হিসেবে রূপান্তরিত হতে পারে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮ থেকে ১১ এবং ১৩ থেকে ২৫ অনুচ্ছেদে এ নীতিগুলো বর্ণিত হয়েছে। ১৯৭৭ সালের ১ নং আদেশে সংশোধনী অনুসারে সংবিধানের এসব অনুচ্ছেদে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহ হচ্ছে:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা– এই নীতিসমূহ এবং এগুলো থেকে উৎসরিত দ্বিতীয়ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে বিবেচিত হবে। নিম্নে প্রধান ৪টি মূলনীতি উপস্থাপন করা হলো–

অনুচ্ছেদ ৯– জাতীয়তাবাদ (Nationalism) : বাঙালি জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা দিয়ে এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছেন সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

অনুচ্ছেদ ১০– সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি (Socialism and freedom from exploitation) : মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

অনুচ্ছেদ ১১– গণতন্ত্র ও মানবাধিকার (Democracy and human rights) : প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে। মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।

অনুচ্ছেদ ১২– ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা (Secularism and freedom of religion) : ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য–

ক. সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা;

খ. রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো বিশেষ ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান;

গ. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার;

ঘ. কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে।

উপর্যুক্ত ৪টি নীতি ছাড়াও এই নীতিসমূহ হতে উৎসারিত ২য় ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায় :

ক. অর্থনৈতিক আদর্শ সম্পর্কিত নীতিসমূহ

- **অনুচ্ছেদ-১৩ (মালিকানার নীতি) :** দেশের উৎপাদন ও উৎপাদিত সম্পদের বণ্টন পদ্ধতির মালিক হবে জনগণ। এই লক্ষ্যে সম্পত্তিতে নিম্নোক্ত তিন প্রকারের মালিকানা থাকবে–
  - রাষ্ট্রীয় মালিকানা।
  - সমবায়ী মালিকানা।
  - ব্যক্তিগত মালিকানা।
- **অনুচ্ছেদ-১৫ (মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা) :** রাষ্ট্র জনগণের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে–

  ক. কর্মের অধিকার।
  খ. অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা।
  গ. বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার।
  ঘ. বিপদগ্রস্ত কিংবা অভাবগ্রস্তদের জন্য সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা।
- **অনুচ্ছেদ-১৬ (গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব) :** শহর ও গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র–

  ক. কৃষি বিপ্লবের বিকাশ
  খ. গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতায়ন
  গ. কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্প
  ঘ. শিক্ষা
  ঙ. যোগাযোগ ব্যবস্থা ও
  চ. জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ইত্যাদি বিকাশের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- **অনুচ্ছেদ-১৯ (সুযোগের সমতা) :** সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবেন। মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান বিলোপ করার জন্য এবং সম্পদের সুষম বণ্টনসহ দেশের সর্বত্র সমান ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

খ. সামাজিক আদর্শ সম্পর্কিত নীতিসমূহ : সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করবে।

- **অনুচ্ছেদ-১৪ (কৃষক-শ্রমিক মুক্তি) :** মেহনতি মানুষ অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিক ও জনগণের অনগ্রসর অংশকে রাষ্ট্র শোষণমুক্ত করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- **অনুচ্ছেদ-১৭ (অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা) :** রাষ্ট্র-একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক বালিকার জন্য বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবে। আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- **অনুচ্ছেদ-১৮ (জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা) :** রাষ্ট্র- জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন করবেন। সুনির্দিষ্ট আইন ব্যতীত মদ ও অন্যান্য ক্ষতিকারক বা মাদক পানীয় নিষিদ্ধ করবেন। গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিষিদ্ধ করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

গ. আইন ও শাসন ব্যবস্থার সংস্কারমূলক নীতিসমূহ

- **অনুচ্ছেদ-২২ (নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ)**
- **অনুচ্ছেদ-২৩ (জাতীয় সংস্কৃতি) :** রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- **অনুচ্ছেদ-২৪ (জাতীয় স্মৃতিনির্দশন) :** রাষ্ট্র বিশেষ শৈল্পিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন স্মৃতি নিদর্শনকে বিকৃতি ও বিনাশ থেকে রক্ষা করবে।

ঘ. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আদর্শের নীতি

- **অনুচ্ছেদ-২৫ (আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন) :** বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আদর্শ কিরূপ হবে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ২৫ অনুচ্ছেদে। এখানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে বলা হয়েছে বাংলাদেশ অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। এবং

- ✓ আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান করবে।
- ✓ আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।
- ✓ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার করবে।
- ✓ সাধারণ এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা করবে।
- ✓ প্রত্যেক জাতির নিজের ইচ্ছামতো নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণের অধিকার সমর্থন করবে। সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সমর্থন করবে।

৫. ১৯৯৭ সালের পার্বত্য শান্তিচুক্তি কতটা সফল হয়েছে? পার্বত্য অঞ্চলের বিদ্যমান সমস্যা এবং শান্তি ও উন্নয়নের জন্য আপনার প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ করুন। ২০

নমুনা উত্তর : পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের ভৌগোলিক সৌন্দর্য, জাতিগোষ্ঠীর বৈচিত্র্য এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের এক মনোরম ভূভাগ। পাহাড়, অরণ্য, নদী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের নিজস্ব জীবনপ্রবাহ এই অঞ্চলকে দিয়েছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পরিচয়। অথচ উন্নয়ন ও শান্তির বিশাল সম্ভাবনাময় এই অঞ্চল স্বাধীনতার পরপরই রাজনৈতিক অবিশ্বাস, ভূমি-সংকট, প্রশাসনিক দ্বন্দ্ব ও জাতিগোষ্ঠীদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের টানাপোড়েনের ফলে এক দীর্ঘ সংঘাতের অঙ্গনে পরিণত হয়। দুই দশকব্যাপী এই সংঘাত মানুষের প্রাণহানি, বাস্তুচ্যুতি ও অর্থনৈতিক স্থবিরতা সৃষ্টি করে। এই অস্থিরতার অবসান ঘটাতে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি শান্তি, আস্থা ও উন্নয়নের নতুন পথচলার প্রস্তাবনা নিয়ে আসে। দুই দশকের বেশি সময় অতিক্রান্ত আজ প্রয়োজন—চুক্তির বাস্তবতা, সাফল্য ও ব্যর্থতাকে বিশ্লেষণমূলকভাবে মূল্যায়ন করা।

পার্বত্য শান্তিচুক্তি : উদ্দেশ্য ও কাঠামো ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত চুক্তিটি চারটি প্রধান অংশে বিভক্ত—

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
২. জেলা পরিষদ শক্তিশালীকরণ
৩. ভূমি-সংস্কার ও ভূমি কমিশন গঠন
৪. সশস্ত্র কার্যক্রম পরিত্যাগ ও নিরস্ত্রীকরণ

এর মূল উদ্দেশ্য ছিল:

- সংঘাতের অবসান
- ভূমি-সংকটের সমাধান
- পাহাড়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সুরক্ষা
- রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতি
- উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের ক্ষমতায়ন

শান্তিচুক্তির সাফল্যসমূহ :

১) সশস্ত্র সংঘাতের অবসান : চুক্তির মাধ্যমে দুই দশকের গৃহযুদ্ধ-সদৃশ অবস্থা শেষ হয়। পাহাড়ে বড় ধরনের সামরিক সংঘর্ষ বন্ধ হয় এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিকতার দিকে ফিরে আসে।

২) শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন : ভারতসহ বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নেওয়া হাজারো পাহাড়ি পরিবারের প্রত্যাবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা মানবিক সংকট লাঘবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩) আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদের মাধ্যমে ক্ষমতাবিকেন্দ্রীকরণ : চুক্তির ফলে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রতিনিধি নিয়োগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্থানীয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন ও তদারকি সহজ হয়।

৪) উন্নয়ন প্রকল্পে গতি : যোগাযোগব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদিতে দৃশ্যমান অগ্রগতি ঘটে। সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন উদ্যোগ বেড়ে যায়।

৫) সামাজিক আস্থায় অগ্রগতি : যদিও সম্পূর্ণ নয়, তবুও পাহাড়ি-বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে আস্থার নতুন ভিত্তি তৈরি হয়। রাজনৈতিক সংলাপ ও আলোচনার পরিবেশ গড়ে ওঠে।

বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ও ব্যর্থতা : পার্বত্য শান্তিচুক্তির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধাবস্থা শেষ হলেও পাহাড়ে সম্পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। চুক্তির অনেক ধারা বাস্তবায়নের পরও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার এবং স্থানীয় জনগণের আস্থার সংকট আজও সমাধান হয়নি। বিশেষ করে ভূমি কমিশনের কার্যকারিতা, জরিপ–সংক্রান্ত জটিলতা এবং প্রশাসনিক সমন্বয়হীনতার কারণে পাহাড়ের সাধারণ মানুষ প্রত্যাশিত সুফল পাচ্ছে না। এতে স্থানীয় ক্ষোভ বজায় আছে এবং রাজনৈতিক আস্থা প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।

চুক্তির অন্যতম বড় ব্যর্থতা হলো পাহাড়ে সক্রিয় বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর উপস্থিতি। বর্তমানে জেএসএস (সন্তু লারমা)–এর মূলধারার বাইরে বিচ্ছিন্ন অংশ, ইউপিডিএফ (United People's Democratic Front) এবং তাদের ভিন্নমতাবলম্বী ইউপিডিএফ–গণতান্ত্রিক শাখা পৃথকভাবে সশস্ত্র অবস্থানে রয়েছে। এদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার, চাঁদাবাজি, আধিপত্য স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ–সংক্রান্ত সহিংসতা নিয়মিত ঘটছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে এসব গোষ্ঠী রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছাড়িয়ে আর্থিক স্বার্থ ও এলাকা–নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, যা স্থানীয় মানুষের নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক জীবনযাপনকে ব্যাহত করে।

এ ছাড়াও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (KNF) বা কুকি চিন বিদ্রোহী গোষ্ঠী বান্দরবান এলাকায় সক্রিয় হয়ে নতুন নিরাপত্তা–ঝুঁকি তৈরি করেছে। KNF–এর ব্যাংক ডাকাতি, পাহাড়ি-বাঙালি উভয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হামলা, এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সশস্ত্র শিবির স্থাপনের মতো কর্মকাণ্ড আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। এই গোষ্ঠীর উত্থান প্রমাণ করে যে শান্তিচুক্তি–পরবর্তী শূন্যস্থান, অভ্যন্তরীণ বঞ্চনা এবং সীমান্ত–সংলগ্ন ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা নতুন ধরনের সশস্ত্র কার্যক্রমকে উৎসাহিত করছে।

ফলে দেখা যায়, শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন কাঠামোগতভাবে এগোলেও মাঠপর্যায়ে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ দুর্বল রয়েছে। সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর দ্বন্দ্ব, চাঁদাবাজি, হত্যা ও অপহরণ—সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের আস্থা পুনরুদ্ধার ব্যাহত হচ্ছে। নিরাপত্তাহীনতা, ভূমি বিরোধ এবং রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা মিলিয়ে চুক্তির সার্বিক উদ্দেশ্য—একটি স্থায়ী শান্তি ও টেকসই উন্নয়ন—এখনও বাস্তব রূপ পায়নি।

৬. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের গঠন ও ক্ষমতা উল্লেখ করুন। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা আলোচনা করুন। ২০

নমুনা উত্তর : আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো নির্বাচন। একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ একটি প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য, আর বাংলাদেশে এই দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সাংবিধানিক সংস্থা।

সাংবিধানিক ভিত্তি ও গঠন : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী।

গঠন প্রক্রিয়া : একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক (অনধিক চারজন) নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। একাধিক কমিশনারের উপস্থিতিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সভাপতিরূপে কাজ করেন।

পদের মেয়াদ ও মর্যাদা : প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনারের পদের মেয়াদ কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে ৫ বছর। এদের পদমর্যাদা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সমতুল্য। তবে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ৫ বছর দায়িত্ব পালনের পর প্রজাতন্ত্রের অন্য কোনো লাভজনক পদে নিয়োগ পেতে পারেন না।

প্রশাসনিক কাঠামো : কমিশনের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন সচিবের নেতৃত্বে একটি জনবল কাঠামো রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের সচিব একজন জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তা এবং কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি এই জনবল কাঠামো নির্ধারণ করেন।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী : সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশন তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে এবং কেবল সংবিধান ও আইনের অধীন হবে। নির্বাচন কমিশন কেবল নির্বাচন পরিচালনা নয়, বরং নির্বাচন সংক্রান্ত আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে। নিচে কমিশনের প্রধান কার্যাবলীগুলোর একটি বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

১. ভোটার তালিকা তৈরি ও হালনাগাদকরণ : সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করা কমিশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। প্রাপ্তবয়স্কদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা, মৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া, তালিকা সংশোধন এবং ভোটকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে কমিশন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করে।

২. সীমানা নির্ধারণ : সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা হয়। কমিশন বিভিন্ন অঞ্চলের আয়তন, জনসংখ্যা, এবং ভূ-খণ্ডগত অবস্থানের মতো বিষয়গুলো বিবেচনা করে এই কাজটি করে।

৩. নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা : নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে কমিশন নির্বাচনী তফসিল তৈরি করে ঘোষণা করে। এই তফসিলে নির্বাচনের সময়, তারিখ, নির্বাচনী এলাকা, নির্বাচন পরিচালনার নিয়ম-কানুন, ভোটদানের নিয়ম, প্রার্থীর যোগ্যতা, এবং নির্বাচনী প্রচারের বিধিনিষেধ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

৪. রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ : নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য কমিশন বিভিন্ন স্তরে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ দেয়, যারা নির্বাচন পরিচালনায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন।

৫. প্রার্থীতা যাচাই : রাষ্ট্রপতি, সংসদ এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র বিতরণ, গ্রহণ এবং যাচাই-বাছাই করা কমিশনের অন্যতম প্রধান কাজ। এখানে প্রার্থীরা যে তথ্য প্রদান করেছেন, তার সত্যতা যাচাই করে প্রার্থীর যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়।

৬. ভোট গ্রহণ: নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী ঘোষিত দিনে সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৭. চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ : ভোট গ্রহণের পর নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ফলাফল যোগ করে, ফলাফল একত্রীভূত করে এবং সরকারি গেজেটে তা প্রকাশ করে থাকে।

৮. নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল গঠন : নির্বাচনী অভিযোগ ও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল গঠন করে এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন করে।

৯. নির্বাচনী সদস্যের অযোগ্যতা যাচাই : কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর যদি তার সদস্যপদ নিয়ে কোনো প্রশ্ন বা বিতর্ক দেখা দেয়, তবে বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে কমিশন যে সিদ্ধান্ত দেয়, সেটিই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী গঠিত হয়েছে এবং এটি আইনগতভাবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। দেশে অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কমিশন তার উল্লিখিত সকল কার্যাবলী সম্পাদন করে চলেছে। তবে বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাগুলো দূর করে কমিশনকে আরও শক্তিশালী, কার্যকর ও জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন, যাতে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে স্বচ্ছ সরকার গঠিত হতে পারে।

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচন কেবল ক্ষমতার হস্তান্তরের আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং এটি নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার, রাষ্ট্রের বৈধতা ও গণতন্ত্রের গভীরতা পরিমাপের অন্যতম মানদণ্ড। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন তখনই সম্ভব হয়, যখন নির্বাচন কমিশন ন্যায়, নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার নীতিতে কাজ করে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (ইসি) সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে নির্বাচনকে প্রভাবমুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক রাখতে যে বিস্তৃত দায়িত্ব পালন করে, তার প্রত্যেকটি ধাপই গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলে।

১) নির্বাচন ব্যবস্থার নীতি-প্রণয়ন, নির্দেশনা ও স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততা : ইসি একটি নির্বাচনের কাঠামো ঠিক করে দেয় নীতি, নির্দেশনা ও আচরণবিধির মাধ্যমে। এই ধাপে শুধুমাত্র আইন নয়, বরং মাঠপর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকেও বিবেচনায় নিতে হয়।

রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের সাথে সংলাপ : কমিশন নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করে; কিন্তু শুধু দল নয়—মানবাধিকার সংগঠন, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা, সুশীলসমাজ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, নারী সংগঠন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধি—সবাইকে আলোচনায় যুক্ত করা হয়। এ সংলাপ থেকে পাওয়া সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে কমিশন বিধিনিষেধ, প্রচারণা নীতি, আচরণবিধি ও পর্যবেক্ষণ নীতি নির্ধারণ করে।

দেশি–বিদেশি পর্যবেক্ষক দলকে অনুমোদন : নির্বাচনের স্বচ্ছতা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করতে ইসি বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিবন্ধন, নিরাপত্তা ও তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করে। দেশীয় পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোকেও নির্বাচন পূর্ববর্তী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে তারা পেশাদারভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং তাদের রিপোর্ট আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখে। পর্যবেক্ষকদের সীমিত বা বাধাগ্রস্ত করা নির্বাচনকে সন্দেহজনক করে তোলে; তাই এ ক্ষেত্রে কমিশনের সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রবাসী ভোটার অন্তর্ভুক্তি : প্রবাসী নাগরিকরা বাংলাদেশের জনশক্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইসি তাদের অনলাইনে ভোটার তালিকায় নিবন্ধন, বায়োমেট্রিক ছাড়াই আবেদন যাচাই, বিদেশস্থ দূতাবাসের মাধ্যমে ভেরিফিকেশন—এসব ব্যবস্থা চালু করে ধীরে ধীরে তাদের ভোটাধিকারকে কার্যকর করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

২) নির্বাচনী পরিবেশ, আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা : একটি নির্বাচন তখনই বিশ্বাসযোগ্য হয়, যখন পরিবেশ শান্ত, সহিংসতামুক্ত ও ভোটারের জন্য নিরাপদ থাকে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বিত পরিচালনা : ইসি মাঠপর্যায়ের পুলিশের পাশাপাশি র‍্যাব, বিজিবি, কোস্টগার্ড এবং প্রয়োজন হলে সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে। এটির লক্ষ্য—

- ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র চিহ্নিত করা
- অস্ত্র উদ্ধার অভিযান পরিচালনা
- সেনা মোতায়েন (MACP বা স্ট্রাইকিং ফোর্স)
- বিশেষ টহল ও চেকপোস্ট বসানো
- নির্বাচন-পূর্ব উত্তেজনাপূর্ণ এলাকায় ফ্ল্যাগমার্চ

নির্বাচনকালীন সেনা বাহিনীকে কমিশন সাধারণত "স্ট্রাইকিং ফোর্স" বা "মোবাইল টিম" হিসেবে ব্যবহার করে, যাতে তারা দ্রুত সংঘাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এটি ভোটারের আস্থা বাড়ায় ও দলীয় প্রভাব কমায়।

সংঘাত মনিটরিং সেল : নির্বাচন-পূর্ব, চলাকালীন ও পরবর্তী পর্যায়ে সংঘাত, সহিংসতার ঝুঁকি, সামাজিক মাধ্যমে উসকানি—এসব শনাক্ত করতে কমিশন মনিটরিং সেল পরিচালনা করে। এ সেল রিপোর্টের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

৩) অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিতে বিশেষ ব্যবস্থা : নির্বাচন তখনই সফল হয় যখন সমাজের সকল গোষ্ঠী সমানভাবে ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়।

- নারী, প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা,
- আলাদা বুথ
- হুইলচেয়ার
- র‍্যাম্প
- প্রাধিকার ভিত্তিতে সারি
- দূরবর্তী অঞ্চলে লজিস্টিক সহায়তা
- পাহাড়ি অঞ্চল, উপকূল, চরাঞ্চল—এসব স্থানে বিশেষ পরিবহন, অতিরিক্ত নিরাপত্তা ও ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।
- দলিত ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি
- ভাষাগত বাধা দূর করতে স্থানীয় ভাষায় নির্দেশাবলি, সচেতনতা কর্মসূচি, এবং বিশেষ ভোটার শিক্ষা পরিচালনা করা হয়।

৪) মনোনয়ন, প্রচারণা, ভোটগ্রহণ ও ফলাফল ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা রক্ষা :

- নিরপেক্ষ মনোনয়ন যাচাই
- প্রার্থীর— তথ্য অসত্য
- ঋণখেলাপি
- সাজার রেকর্ড
- সম্পদের ভুল বিবরণ
- এসব পাওয়া গেলে ইসি মনোনয়ন বাতিল করতে পারে।

লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতকরণ : এটি নির্বাচন স্বচ্ছতার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। কমিশন—

- রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার নিরীক্ষণ
- ক্ষমতাসীন দলের অতিরিক্ত সুবিধা সীমিতকরণ
- প্রশাসনের পক্ষপাত প্রতিরোধ
- প্রতিপক্ষের প্রচারণায় বাধা বন্ধে নির্দেশ
- ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে।
- অনলাইন–অফলাইন প্রচারণা নিয়ন্ত্রণ

ডিজিটাল যুগে গুজব, ভুয়া তথ্য ও ঘৃণাবার্তা নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে। এ জন্য ইসি—

- সামাজিক মিডিয়া মনিটরিং
- ডিজিটাল আচরণবিধি
- ভুয়া আইডি শনাক্ত
- সাইবার ইউনিটের সঙ্গে সমন্বয়
- ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

অফলাইন প্রচারণায় সাউন্ড সিস্টেম, পোস্টার, মিছিল, ব্যানার— সবকিছুর জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম প্রয়োগ করা হয় যাতে অন্য দল ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

ভোটগ্রহণ–সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ : প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী— সবার জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে থাকে—

- ব্যালটপেপার পরিচালনা
- ইভিএম ব্যবহারে দক্ষতা
- সঙ্কটমুহূর্ত মোকাবিলা
- নারী ও প্রতিবন্ধী ভোটারের প্রতি সংবেদনশীল আচরণ
- ফলাফল ব্যবস্থাপনা ও স্বচ্ছ গণনা

ভোট গ্রহণের পর—

- কেন্দ্রভিত্তিক গণনা
- পর্যবেক্ষক উপস্থিতি
- কেন্দ্রীয় সার্ভারে ডাটা আপলোড
- পুনঃগণনার আবেদন নিষ্পত্তি
- সবকিছুই কমিশনের অধীন।

৫) নির্বাচনী অপরাধ মোকাবিলা, কেন্দ্র বাতিল ও পুনঃভোটের সিদ্ধান্ত :

ইসি নির্বাচন চলাকালীন যেকোনো অনিয়ম, কেন্দ্র দখল, জাল ভোট, সহিংসতা, ব্যালট ছিনতাই শনাক্ত করলে—

- সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র বাতিল করতে পারে
- পুনঃভোট দিতে পারে
- নির্বাচন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করতে পারে
- প্রার্থীকে শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত করতে পারে
- এ ধরনের কঠোর ব্যবস্থা নির্বাচনকে অধিক গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

৬) নির্বাচন-পরবর্তী পর্যালোচনা, প্রতিবেদন ও নীতিগত সংস্কার :

একটি নির্বাচন শেষ হলেও কাজ শেষ হয় না। কমিশন—

- পর্যবেক্ষক রিপোর্ট
- অভিযোগের ধরণ
- রাজনৈতিক দলের মন্তব্য
- ভোটার অংশগ্রহণের পরিসংখ্যান
- প্রযুক্তিগত ঘাটতি

সব বিশ্লেষণ করে একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরি করে, যা ভবিষ্যতের নির্বাচনে নীতি সংস্কারের ভিত্তি তৈরি করে।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে বহুস্তরীয় ও জটিল দায়িত্ব পালন করে—নীতি প্রণয়ন থেকে ফলাফল ঘোষণার প্রতিটি ধাপে তাদের নিরপেক্ষতা, দক্ষতা ও সতর্কতা একটি নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করে। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা যত তীব্র, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যত জটিল, সমাজ যত বৈচিত্র্যময়—ততই নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামোর কেন্দ্রীয় স্তম্ভ। একটি শক্তিশালী ইসি-ই পারে দেশের নির্বাচনকে সত্যিকার অর্থে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ এবং জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য রাখতে।

৭. **LDC উত্তরণের শর্তগুলি কী কী? বাংলাদেশ কীভাবে LDC উত্তরণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং উত্তরণের পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কোন কোন খাতকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন? লিখুন।** ২০

নমুনা উত্তর :

জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের (Least Developed Country - LDC) তালিকা থেকে উত্তরণ বাংলাদেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। দীর্ঘ পাঁচ দশক এই তালিকায় থাকার পর, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও মানমর্যাদা বৃদ্ধির এটি একটি সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশ ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর এলডিসি থেকে উত্তরণের সময়সীমা নির্ধারণ করেছে। তবে এই উত্তরণ যেমন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে, তেমনি নিয়ে আসবে সুদূরপ্রসারী চ্যালেঞ্জ।

১. এলডিসি কী ও উত্তরণের মানদণ্ড : এলডিসি হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর একটি তালিকা, যা ১৯৭১ সালে প্রথম প্রণীত হয়। এসব দেশকে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধাসহ নানা ধরনের সুবিধা দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

উত্তরণের শর্তাবলী (CDP মানদণ্ড): জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (CDP) প্রতি তিন বছর পরপর তিনটি সূচকের ভিত্তিতে এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর মূল্যায়ন করে। পরপর দুটি ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নে যেকোনো দুটি সূচকে যোগ্যতা অর্জন করলেই উত্তরণের সুপারিশ করা হয়।

সূচক	মানদণ্ড	বাংলাদেশের অর্জন (২০২১)
মাথাপিছু জাতীয় আয় (GNI)	≥ $১,২৩০ মার্কিন ডলার	$১,৮২৭ মার্কিন ডলার
মানবসম্পদ সূচক (HAI)	≥ ৬৬	৭১.৫
অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (EVI)	≤ ৩২	২৭.২

২০১৮ ও ২০২১ সালের মূল্যায়নে তিনটি সূচকেই উত্তীর্ণ হয়ে ২০২৬ সালের জন্য চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। বাংলাদেশই হবে প্রথম দেশ, যারা তিনটি সূচকেই উত্তীর্ণ হয়ে উত্তরণ সম্পন্ন করবে।

এলডিসি উত্তরণের সম্ভাবনা ও সুবিধা : এলডিসি থেকে উত্তরণ বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে।

আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও ভাবমূর্তি : 'গরিব বা স্বল্পোন্নত দেশের' তকমা ঘুচিয়ে দেশটি 'উন্নয়নশীল দেশ' হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। এতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারী ও অংশীদারদের আস্থা বাড়বে।

বিনিয়োগ ও ঋণমান : আন্তর্জাতিক রেটিং এজেন্সিগুলো বাংলাদেশের ঋণমান (Sovereign Credit Rating) উন্নীত করতে পারে। এতে বৈদেশিক ঋণের সুদের হার কমে আসবে এবং অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য স্বল্পসুদে আন্তর্জাতিক ঋণ পাওয়া সহজ হবে। এটি ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট (FDI) আকর্ষণেও সহায়ক হবে।

বাণিজ্যিক সক্ষমতা বৃদ্ধি : উন্নত দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রযুক্তি স্থানান্তরমূলক প্রকল্পে অংশ নিতে আগ্রহী হবে। এর ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশ Global Value Chain (GVC)-এ অধিকতর সংযুক্ত হতে পারবে।

কূটনৈতিক সুবিধা : উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জনের ফলে শ্রমবাজারে (Migrant Labour Export) বাংলাদেশের আলোচনার সক্ষমতা (Negotiating Power) বৃদ্ধি পাবে।

উত্তরণের চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি : উত্তরণের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো হারানো। উত্তরণকে সফল করতে হলে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে:

রপ্তানি খাতে সংকট (GSP/EBA সুবিধা হারানো) : এলডিসি হিসেবে বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের Everything But Arms (EBA)-এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা পায়। ২০২৬ সালের পর এই সুবিধা বন্ধ হলে প্রধান রপ্তানি পণ্য, তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য পণ্যের ওপর ৯-১২% পর্যন্ত শুল্ক বসতে পারে। এতে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রতিযোগিতা হারাতে পারে।

ওষুধশিল্পে মেধাস্বত্ব (TRIPS Waiver) বাতিল : এলডিসি দেশগুলো মেধাস্বত্ব আইনের (TRIPS) ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় পায়, যার ফলে দেশীয় কোম্পানিগুলো জেনেরিক ওষুধ তৈরি করতে পারে। ২০৩৩ সালের আগে উত্তরণ হলে এই সুবিধা চলে যাবে, যা দেশের ওষুধশিল্পের ওপর কড়াকড়ি বাড়াবে এবং স্বল্পমূল্যে ওষুধ প্রাপ্তি কঠিন হতে পারে।

অর্থনৈতিক ভর্তুকি ও সাহায্য হ্রাস : এলডিসি হিসেবে বাংলাদেশ রপ্তানি আয় বা রেমিটেন্সে যে নগদ সহায়তা ও ভর্তুকি দেয়, উত্তরণের পর তা নিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) আপত্তি জানাতে পারে। এছাড়া, সহজ শর্তের বৈদেশিক অনুদান (ODA) এবং জলবায়ু অর্থায়ন (যেমন GCF) হ্রাস পাবে।

ঋণ ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি : স্বল্প সুদের কনসেশনাল ঋণের পরিবর্তে বাজারভিত্তিক বাণিজ্যিক ঋণ (Commercial Loan) গ্রহণ করতে হবে। এতে দেশের ঋণের স্থিতিশীলতা (Debt Sustainability) বজায় রাখা কঠিন হয়ে উঠবে।

GSP Plus-এর কঠিন শর্ত : ইউরোপীয় ইউনিয়নে জিএসপি প্লাস সুবিধা পেতে হলে শ্রম অধিকার, সুশাসন, মানবাধিকার এবং পরিবেশনীতি সংক্রান্ত ২৭টি আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুসরণ করতে হবে, যা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় ও প্রস্তাবনা :

উত্তরণকে একটি 'সাফল্য' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কৌশলগত প্রস্তুতি ও অভ্যন্তরীণ সংস্কার অপরিহার্য:

১. কূটনৈতিক উদ্যোগ : ইউরোপীয় ইউনিয়নে GSP Plus সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য জোরালো কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং শ্রম অধিকার ও পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণে দ্রুত অভ্যন্তরীণ সংস্কার আনতে হবে।

২. রপ্তানি বহুমুখীকরণ : তৈরি পোশাক শিল্পের একক নির্ভরতা কমিয়ে আইটি, ইলেকট্রনিকস, কৃষি-প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়া ও ওষুধ সহ অন্যান্য উচ্চ-প্রযুক্তিনির্ভর খাতে রপ্তানি সম্প্রসারণে বিনিয়োগ ও প্রণোদনা দিতে হবে।

৩. বাণিজ্য চুক্তি সম্প্রসারণ : বিকল্প বাণিজ্য সুবিধা নিশ্চিত করতে ভারতের সঙ্গে CEPA, চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে FTA (মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি) ও PTA (অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি) স্বাক্ষর দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

৪. দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি স্থানান্তর : প্রযুক্তি হস্তান্তর কাঠামো (Technology Transfer Framework) তৈরি করে বিদেশি বিনিয়োগ থেকে প্রযুক্তি গ্রহণ এবং শ্রমিকদের উৎপাদন দক্ষতা বাড়ানোর ওপর জোর দিতে হবে।

৫. প্রশাসনিক সংস্কার : ব্যবসা সহজ করার সূচক উন্নত করতে কাস্টমস প্রক্রিয়া, লাইসেন্সিং এবং ব্যবসা নিবন্ধনের সময়সীমা কমাতে হবে।

৬. সমন্বিত রূপান্তর কৌশল : বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বেসরকারি খাত এবং উন্নয়ন অংশীদারদের নিয়ে একটি "LDC Graduation Implementation Taskforce" গঠন করে সময়ভিত্তিক একটি রোডম্যাপ তৈরি ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

এলডিসি থেকে উত্তরণ হলো বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা, যা দেশের ভূ-অর্থনৈতিক পরিচিতিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করবে। অধ্যাপক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য যেমনটি বলেছেন, "যেকোনো শিক্ষিত মানুষ এলডিসি উত্তরণ চাইবে।" তবে উত্তরণ পেছানোর পক্ষে যে মত রয়েছে, তাতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ভুল বার্তা যেতে পারে। তাই, প্রস্তুতি ছাড়া উত্তরণ একটি ফাঁদ হতে পারে—এই সতর্কতাকে মাথায় রেখে, দ্রুত প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই ও স্থিতিস্থাপক উন্নয়ন (inclusive, sustainable and resilient development) নিশ্চিত করতে হবে।

৮. ক. **বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের নিয়ামকসমূহ আলোচনা করুন।** ১০

নমুনা উত্তর :

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি মূলত "সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়"—এই মূল্যনীতির ভিত্তিতে গঠিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সহযোগিতা এবং সমান মর্যাদা রক্ষার এই প্রাচীন নীতি বাংলাদেশের কূটনীতিকে মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক ও শান্তিকেন্দ্রিক চরিত্র প্রদান করে। এ নীতিগত কাঠামোর সংবিধানিক ভিত্তি রয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে, যেখানে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণের মৌল নীতিগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে নীতিগুলো অনুসরণ করতে রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেয়, সেগুলো হলো—

ক. জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা
খ. অপর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা
গ. আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান
ঘ. আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের প্রতি শ্রদ্ধা

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের নিয়ামকসমূহ —

সংবিধান নৈতিক ভিত্তি দেয়, কিন্তু বাস্তব অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক উপাদান পররাষ্ট্রনীতির অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে। এই নিয়ামকগুলিই বাস্তবে পররাষ্ট্রনীতিকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করে।

১. ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা

বাংলাদেশ তিনদিকে স্থলবেষ্টিত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ফলে—

- প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে স্থিতিশীল সম্পর্ক অপরিহার্য
- আঞ্চলিক নিরাপত্তা, বাণিজ্য, নৌ-যোগাযোগ, সমুদ্রসম্পদ ও ব্লু ইকোনমি কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ

দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা বাংলাদেশের কূটনীতি ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলে। এ অবস্থান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকে বাস্তববাদী, সতর্ক ও কৌশলগত করে।

২. জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা অগ্রাধিকার

রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য—

- সার্বভৌমত্ব রক্ষা
- ভৌগোলিক অখণ্ডতা সংরক্ষণ
- সীমান্ত নিরাপত্তা
- জ্বালানি নিরাপত্তা
- অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ
- অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা

এসব কারণে সামরিক সহযোগিতা, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, সমুদ্রসীমা নির্ধারণ, সন্ত্রাসবিরোধী কূটনীতি—পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৩. অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও উন্নয়নকেন্দ্রিকতা

উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে অর্থনীতি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত রপ্তানি, রেমিট্যান্স, বিনিয়োগ ও বৈদেশিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। তাই—

- রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ
- FDI আকর্ষণ
- শ্রমবাজার রক্ষা
- উন্নয়ন সহায়তা (IMF, ADB, World Bank)
- প্রযুক্তি স্থানান্তর
- অবকাঠামো উন্নয়ন

এগুলো পররাষ্ট্রনীতির দিকনির্দেশ পুনর্গঠিত করে।

৪. জনসংখ্যাগত উপাদান ও বৈদেশিক শ্রমবাজার

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শ্রম রপ্তানিকারক দেশ। ফলে—

- মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া, ইউরোপে শ্রমবাজার কূটনীতির অংশ
- রেমিট্যান্স নিরাপত্তা রাষ্ট্রের অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য
- অভিবাসন নীতি ও শ্রমসংক্রান্ত চুক্তি পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে

৫. জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত ঝুঁকি

বিশ্বে অন্যতম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে—

- জলবায়ু কূটনীতি
- ক্ষতিপূরণ ও অভিযোজন তহবিল
- সমুদ্রপৃষ্ঠ উচ্চতা বৃদ্ধির মোকাবিলা
- আন্তর্জাতিক জলবায়ু চুক্তির সক্রিয় অনুসরণ

এসব বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।

৬. আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বহুপাক্ষিক কাঠামো

বাংলাদেশ বহু আন্তর্জাতিক কাঠামোর সদস্য—জাতিসংঘ, WTO, IMO, IOM, SAARC, BIMSTEC, ILO ইত্যাদি। এ সব সংস্থার নীতি ও বৈশ্বিক বাধ্যবাধকতা পররাষ্ট্রনীতির দিক নির্দেশ করে। বিশেষত—

- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন
- বৈশ্বিক বাণিজ্যনীতি
- সমুদ্র আইন
- মানবাধিকার কাঠামো

এসব বাংলাদেশের কূটনীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র দেয়।

৭. অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কাঠামো ও নীতি নির্ধারণের মানসিকতা : রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দর্শন, প্রশাসনিক কাঠামো, নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও জাতীয় ঐক্য—পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে গুরুত্ব বহন করে। সরকারের পরিবর্তন কূটনৈতিক অগ্রাধিকারেও পরিবর্তন আনে।

৮. আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও বৈশ্বিক বাণিজ্য কাঠামো : গোলামালি নির্ভরতা, পোশাক খাত, জ্বালানি বাজারের ওঠানামা, বৈশ্বিক মন্দা বা প্রতিযোগিতা পররাষ্ট্রনীতিকে আরও অর্থকেন্দ্রিক করে তুলেছে।

৯. সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও মানবিক আদর্শ : বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, মানবতার মূল্য, ন্যায়বিচার ও সহযোগিতার নীতিকে প্রাধান্য দেয়। এর ফলে—

- মানবিক কূটনীতি
- শান্তি প্রতিষ্ঠার ভূমিকা
- শরণার্থী সংকটে দায়িত্বশীলতা
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বৈশ্বিক সহযোগিতা

এসব নীতির অনুসরণ পররাষ্ট্রনীতিকে নৈতিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করে।

খ. **বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।** ১০

কোন দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের অনেক দেশ আছে যাদের মাথাপিছু আয়ের সিংহভাগ শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে অর্জিত হয়। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল ঘন বসতিপূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র। আমাদেরও কিন্তু নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যেমন: ১। নবায়নযোগ্য সম্পদ- মাছ, পানি, বনভূমি প্রভৃতি, ২। অনবায়নযোগ্য সম্পদ- প্রাকৃতিক সম্পদ, তেল, গ্যাস, কয়লা, বালি প্রভৃতি।

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ: বাংলাদেশ খনিজ সম্পদ ততটা সমৃদ্ধ নয়। কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব, আর্থিক সংকট, আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব, প্রভৃতির কারণে বাংলাদেশ খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণ করতে পারেনি। দেশের উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ হলো- প্রাকৃতিক গ্যাস। দেশের অন্যান্য খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে চুনাপাথর, কয়লা, শ্বেতমৃত্তিকা, কাঁচবালি, কঠিন শিলা প্রভৃতি। নিচে বাংলাদেশের খনিজ সম্পদগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো।

বাংলাদেশ খনিজ সম্পদগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) অখাতব খনিজ সম্পদ ও (খ) ধাতব খনিজ সম্পদ

(ক) অধাতব খনিজ সম্পদ : বাংলাদেশের অখাতব খনিজ সম্পদগুলোর সম্পর্কে সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য বিবরণ উল্লেখ করা হলো-

১। প্রাকৃতিক গ্যাস হলো বাংলাদেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ এবং দেশের প্রধান বাণিজ্যিক জ্বালানি শক্তি। এটি মূলত মিথেন দ্বারা গঠিত।
অবস্থান ও আবিষ্কার : দেশে প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় ১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুরে।
প্রধান ক্ষেত্র : সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হলো তিতাস (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), যা ১৯৬২ সালে আবিষ্কৃত হয়। এছাড়া বিবিয়ানা একটি বৃহৎ উৎপাদনশীল ক্ষেত্র।
সংখ্যা : বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ২৯টির বেশি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।
মজুদ : বর্তমানে মোট আনুমানিক ২৮.৪ TCF রিজার্ভের মধ্যে ২০.৪ TCF উত্তোলিত হয়ে গেছে; অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য মজুত মাত্র ৭–৮ TCF। দৈনিক চাহিদা ৩৮০০–৪২০০ MMCFD হলেও সরবরাহ মাত্র ২৭০০ MMCFD, ফলে প্রায় ১১০০ MMCFD ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। এই ঘাটতি শিল্প উৎপাদন, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও কৃষি ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

২। **কয়লা :** বাংলাদেশে কয়লা প্রধান খনিজ সম্পদগুলোর মধ্যে অন্যতম। দেশের কয়লার প্রধান দুই ধরন হলো লিগনাইট ও বিটুমিনাস। লিগনাইট নরম, আর্দ্রতাসম্পন্ন ও কম কার্বনযুক্ত, যা প্রধানত বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও স্থানীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। বিটুমিনাস কয়লা শক্ত, উচ্চ কার্বনযুক্ত এবং উচ্চ তাপমানসম্পন্ন, শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের কয়লার মোট রিজার্ভ প্রায় ৭,৮২৩ মিলিয়ন টন, যার মধ্যে বড়পুকুরিয়ার কয়লা উত্তোলনযোগ্য ৬৪ মিলিয়ন টন। কয়লা উত্তোলনে ধুলা, মিথেন নিঃসরণ, ভূমিধস ও খনি বিপর্যয়সহ পরিবেশগত ঝুঁকি রয়েছে। তাই আধুনিক প্রযুক্তি ও পরিকল্পিত উত্তোলন অপরিহার্য।

৩। **কঠিন শিলা (Hard Rock) :** কঠিন শিলা গৃহনির্মাণ, রাস্তাঘাট, রেললাইন, সেতু নির্মাণ, ব্রীজ-কালভার্ট তৈরি প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের নির্মাণ সামগ্রীর সংকট রয়েছে। বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ ১৯৬৬ সালে রংপুর জেলার রাণীপুকুর এবং দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সন্ধান পায়। কঠিন শিলার অবস্থান রাণীপুকুরে ১৩৫ মিটার এবং মধ্যপাড়ায় ১৫২ থেকে ১৭০ মিটার মাটির নিচে রয়েছে। এখানকার কঠিন শিলা প্রিক্যামব্রিয়ান যুগে সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

৪। **চুনাপাথর (Limestone) :** ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাটে প্রথমে চুনাপাথরের খনির সন্ধান পাওয়া যায়। এখানকার চুনাপাথর সিলেটের সিমেন্ট কারখানার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরে এই জেলার বাগলিবাজার ও লালখানে চুনাপাথর আবিষ্কৃত হয়। ১৯৭০ সালে ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ জয়পুরহাটে আরও একটি চুনাপাথরের খনি আবিষ্কার করে। জয়পুরহাট চুনাপাথরের উপর ভিত্তি করে এখানে একটি সিমেন্ট কারখানা নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ ১৯৭০ সালে নওগাঁ জেলার শাহবাজপুর ও পরানগরে চুনাপাথরের খনি আবিষ্কার করে। এছাড়াও সীতাকুণ্ড ও শাঁফাই নবাবগঞ্জে চুনাপাথরের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনেস হোলসযুক্ত চুনাপাথর রয়েছে। জিনজিরারির বেশিরভাগ ভূমিতে বালি ও মাটির নিচে এই চুনাপাথর রয়েছে। হেয়াদায়ে এবং দক্ষিণপাড়ার বেলাভূমিতে বালির নিচেও এই প্রকৃতির চুনাপাথর পাওয়া যায়। এখানকার চুনাপাথরের বিভিন্ন প্রকার শামুক, ঝিনুক, কড়িযুক্ত সামুদ্রিক জীবের খোলস জমে সৃষ্টি হয়েছে।

৫। **নুড়ি পাথর (Gravel) :** হিমালয় পর্বতের পাদদেশে নুড়িপাথর সঞ্চিত আছে। এই নুড়ি পাথর বর্ষাকালে নদীর উজান প্রবাহে বা পাহাড়ী ঢালু পথে বালি দ্বারা বাহিত হয়ে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সীমান্ত এলাকায় চলে আসে। নুড়ি পাথরের প্রধান ক্ষেত্রগুলো হল- সিলেট জেলার ভোলাগঞ্জ ও পিয়ানগাঙ্গ, পঞ্চগড় জেলার পঞ্চগড় ও তেতুলিয়া এবং লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম। সীমান্ত এলাকায় প্রায় ১০ মিলিয়ন ঘনমিটার নুড়ি পাথর সঞ্চিত আছে। এই নুড়িপাথর বিভিন্ন নির্মাণ কার্যে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত এই পাথর ব্রীজ, কালভার্ট, ভবন, পাকারাস্তা, রেলপথ প্রভৃতি নির্মাণে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৬। **সৈকত বালি (Beach sand) :** বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সমুদ্র সৈকতে এই বালি রয়েছে। এই বালিকে আবার তেজস্ক্রিয় বালিও বলা হয়ে থাকে। এখানে সঞ্চিত তেজস্ক্রিয়বালির মধ্যে জিরকন, মোনাজাইট, ইলমেনাইট, গারনেট, ম্যাগনেটাইট, কায়ানাইট, রুটাইল সঞ্চিত আছে বলে ধারণা করা হয়।

৭। **গন্ধক (Sulphur) :** বাংলাদেশে এখনো গন্ধকের উৎপাদন তেমন বেশি নয়। দেশে কেবলমাত্র কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া দ্বীপে গন্ধক আবিষ্কৃত হয়েছে। বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে, বিশেষ করে সালফিউরিক অ্যাসিড, কীটনাশক, বারুদ প্রভৃতি তৈরি এই খনিজ ব্যবহার হয়ে থাকে।

৮। **নির্মাণ বালি (Construction sand) :** বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদীর তলদেশে বা তীরে পর্যাপ্ত নির্মাণ বালি পাওয়া যায়। এই বালি স্ফটিকমণি দ্বারা গঠিত। তবে সকল স্থানের বালির দানা একই ধরনের নয়। কোন কোন স্থানের বালির দানা খুবই মোটা আবার অনেক স্থানের দানা খুব ছোট। যে নির্মাণ বালির দানা মোটা ও স্ফটিকমণির পরিমাণ বেশি থাকে সেই বালি উন্নত। দেশের রাস্তা, ব্রীজ, গৃহ, কালভার্ট নির্মাণে এইটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৯। **শ্বেত মৃত্তিকা (White Clay) :** বাংলাদেশের নেত্রকোনা, শেরপুর, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর ও নওগাঁ জেলায় শ্বেতমৃত্তিকা পাওয়া যায়। সাধারণত এই মৃত্তিকা সিরামিক শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হয়। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে সিরামিক গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং এই মৃত্তিকা দ্বারা তৈরি করা হয়। ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ সর্বপ্রথম ১৯৫৭ সালে ময়মনসিংহের জেলা দুর্গাপুর থানার ভেদিকুরা গ্রামে শ্বেতমৃত্তিকা আবিষ্কার করেন। ১৯৫৫ সালে নওগাঁ জেলার পাটীতলায় ভূ-গর্ভে শ্বেতমৃত্তিকা আবিষ্কার করা হয়। ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলায় শ্বেতমৃত্তিকা আবিষ্কৃত হয়। দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় শ্বেতমৃত্তিকা ১৯৮৮ সালে আবিষ্কৃত হয়। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার তুল্লা এলাকায় শ্বেতমৃত্তিকা আবিষ্কৃত হয়। ১৯৯৪ সালে দিনাজপুরের দীঘিপাড়ায় কয়লা অনুসন্ধানের সময় শ্বেতমৃত্তিকা আবিষ্কৃত হয়।

১০। **কাঁচবালি (Glass sand) :** এই খনিজ সম্পদটি সাধারণত কাঁচ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। সাম্প্রতিক কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার কাঁচবালির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই এলাকাটির অবস্থান ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি। এছাড়া শেরপুর জেলার বালিজুরিরিতে, হবিগঞ্জ জেলার শাহজী বাজারে দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া ও মধ্যপাড়ায় কাঁচবালি সঞ্চিত আছে। যা ভূ-পৃষ্ঠের নিচে অবস্থিত।

(খ) ধাতব খনিজ সম্পদ (Metallic minerals)

১। **তামা (Copper) :** দিনাজপুরের মধ্যপাড়া ও রংপুরের পীরগঞ্জের ভূ-গর্ভস্থ আগ্নেয় শিলার সাথে মিশ্রিত অবস্থায় আছে বলে জানা গেছে। এই তামা উত্তোলনের সম্ভাবনা যাচাই চলছে। তবে এই বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য এখনও চলছে।

২। **লৌহ আকরিক (Iron ore) :** দিনাজপুরের মধ্যপাড়া অঞ্চলে আগ্নেয় শিলার স্তরে লৌহ আকরিক সঞ্চিত আছে বলে জানা গেছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা আগ্নেয় শিলার ফাটল লৌহ আকরিক সহ অন্যান্য খনিজ উপাদান সঞ্চিত রয়েছে। তবে এই খনিজ সম্পদ এলাকার বিস্তৃতি এখনো নির্ধারিত হয়নি।

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ সম্ভাবনাময় ও বৈচিত্র্যময়, তবে তাদের পূর্ণ ব্যবহার ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য উন্নত প্রযুক্তি, যথাযথ পরিবেশ মনিটরিং, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও নীতি সমন্বয় প্রয়োজন। প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা দেশের প্রধান শক্তি উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ, অন্যদিকে লিমেস্টোন, পিট, বালি ও ভারী মনিক ভবিষ্যতে শিল্প ও অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

৯. **ক. ড. মুহাম্মদ ইউনূসের থ্রি-জিরো তত্ত্ব সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।** ১০

নমুনা উত্তর :

থ্রি-জিরো তত্ত্ব : এটি একটি সামাজিক ব্যবসা (Social Business)-নির্ভর উন্নয়ন দর্শন, যেখানে মুনাফা নয়, বরং সামাজিক কল্যাণকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ড. মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর গ্রন্থ "A World of Three Zeros"- এ যে তত্ত্ব তুলে ধরেছেন, সেটি মূলত তিনটি শূন্য লক্ষ্য অর্জনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে:

১. জিরো দারিদ্য ২. জিরো বেকারত্ব ৩. জিরো কার্বন নিঃসরণ

সামাজিক ব্যবসা কার্যক্রমের মাধ্যমে ড. ইউনূসের থ্রি জিরো তত্ত্বের বাস্তবায়ন ঘটানো সম্ভব।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রভাব :

দারিদ্র্য বিমোচনে : মাইক্রোক্রেডিট-এর ধারণা প্রবর্তন করে ড. ইউনূস যেভাবে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে থ্রি-জিরো মডেল দেশের দারিদ্র্য কমানোর ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে। সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে স্বাবলম্বিতা ও উদ্যোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

কর্মসংস্থানে : থ্রি-জিরো তত্ত্বে শূন্য বেকারত্ব নিশ্চিত করতে গ্রামীণ পর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও সামাজিক ব্যবসা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। এতে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে থ্রি-জিরো তত্ত্বের প্রয়োগ ও নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা :

১. **সামাজিক ব্যবসাভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগ সৃষ্টি :** থ্রি-জিরো তত্ত্ব সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে লাভ নয়, বরং সামাজিক সমস্যা সমাধানকেই লক্ষ্য করে। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজেদের সমস্যা (কৃষিপণ্য বিপণন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানি, পরিবহন) কেন্দ্র করে ছোট ছোট ব্যবসা শুরু করতে পারে। এতে গ্রামীণ পর্যায়ে নারী, যুবক ও কৃষকের কর্মসংস্থান বাড়বে।

২. **পরিবেশবান্ধব কৃষি ও গ্রিন টেকনোলজির প্রসার :** জিরো কার্বন লক্ষ্য পূরণে গ্রামীণ এলাকায় সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস, জৈব সার উৎপাদন, কৃষিভিত্তিক পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্য উৎপাদন বিষয়ক ব্যবসা গড়ে তোলা হবে। এতে পরিবেশ রক্ষা হবে, আবার স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে।

৩. **ডিজিটাল সামাজিক প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ :** গ্রামীণ অর্থনীতিকে ডিজিটাল করে তোলার মাধ্যমে অনলাইন হস্তশিল্প বিপণন, স্থানীয় পর্যায়ের ই-কমার্স চালু হতে পারে। যুবসমাজ ঘরে বসেই অনলাইনে আয় করতে পারবে।

৪. **উন্নত কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্প স্থাপন :** গ্রামে উৎপাদিত কৃষিপণ্যকে স্থানীয় পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নিলে, এই শিল্পের আশেপাশে বিপুল কর্মসংস্থান হবে।

৫. **বেকারত্ব দূরীকরণে যুব উদ্যোক্তা তৈরি :** থ্রি-জিরো ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ ও সামাজিক ব্যবসা প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ যুব সমাজকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এতে সরকারি চাকরির পেছনে দৌড় কমবে এবং বেকারত্ব হ্রাস পাবে।

৬. **টেকসই উন্নয়ন-ভিত্তিক ব্যবসা :** পরিবেশ বান্ধব নির্মাণ, পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্য উৎপাদন, গ্রিন ফার্মিং, ইকো-ট্যুরিজম এই খাতে সামাজিক ব্যবসার উদ্যোগ নিতে পারলে নতুন কর্মসংস্থানের বড় ক্ষেত্র তৈরি হবে।

সম্ভাব্য উদাহরণ :

- গ্রামের মহিলা-যুবকের জৈব সার উৎপাদন ও বিপণন শুরু
- সৌরশক্তির মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়ে তোলা
- অনলাইন হস্তশিল্প বা গ্রামীণ খাদ্যপণ্য শহরে সরবরাহ করা
- বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বসিয়ে স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- কৃষি ও পশুপালনভিত্তিক প্যাকেজিং ব্যবসা

পরিবেশ সংরক্ষণে : জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশের জন্য শূন্য নিট কার্বন নিঃসরণ অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ড. ইউনূসের তত্ত্বের আলোকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও সবুজ ব্যবসা গড়ে তোলার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব।

সম্ভাবনা :

১. **দারিদ্র্য বিমোচনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি :** সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করা।

২. **নারী উদ্যোক্তা তৈরি :** গ্রামীণ ও শহুরে নারীদের জন্য সহজ অর্থায়ন ও ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি।

৩. **কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ :** ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে বেকার যুবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৪. **টেকসই পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি :** নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সবুজ প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প গড়ে তোলা।

৫. **স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার :** গ্রামীণ সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

৬. **সামাজিক বৈষম্য হ্রাস :** আয় বৈষম্য কমিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন।

৭. **নবীন উদ্যোক্তা তৈরি :** তরুণ সমাজকে সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে উদ্যোগী করে তোলা।

৮. **বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে উন্নয়ন :** সোলার হোম সিস্টেম ও বায়োগ্যাস প্রকল্প সম্প্রসারণ।

৯. **সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি:** দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি।

১০. **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনে সহায়তা :** জাতিসংঘের ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক ভূমিকা।

চ্যালেঞ্জ :

১. **সামাজিক ব্যবসা নিয়ে সচেতনতার অভাব :** এখনো অনেক মানুষ এই ধারণা সম্পর্কে জানে না।

২. **প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দুর্বলতা :** নীতিগত সহায়তা ও আলাদা নীতিমালা না থাকা।

৩. **অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা :** সামাজিক ব্যবসার জন্য বিনিয়োগকারী বা ব্যাংক সহজ শর্তে ঋণ দিতে অনাগ্রহী।

৪. **উদ্যোক্তাদের দক্ষতার ঘাটতি :** নতুন উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব।

৫. **পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির স্বল্পতা :** সাশ্রয়ী ও টেকসই প্রযুক্তি সহজলভ্য না হওয়া।

৬. **নগরায়ন ও ভূমি সংকট :** সবুজ অর্থনীতি গড়তে জমির সংকট ও নগরায়নের চাপ।

৭. **বাজারপ্রবণতার অভাব :** সামাজিক ব্যবসার পণ্য ও সেবা বাজারজাতকরণে অসুবিধা।

৮. **প্রচলিত ব্যবসা সংস্কৃতির বাধা :** মুনাফাকেন্দ্রিক ব্যবসায়ীদের সামাজিক ব্যবসার প্রতি অনীহা।

৯. **জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি :** দুর্যোগ প্রবণ বাংলাদেশে সামাজিক ব্যবসার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে সবুজ উদ্যোগ টেকসই রাখা কঠিন।

১০. **দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ঘাটতি :** স্বল্পমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য টেকসই উদ্যোগ পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়ে।

খ. **বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে ও নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টি করতে শ্রম কূটনীতির ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।** ১০

নমুনা উত্তর :

শ্রম কূটনীতি বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির বিদ্যমান সমস্যা মোকাবিলা এবং নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শ্রম কূটনীতির মাধ্যমে বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন, শ্রমিকের অধিকার ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান, মধ্যস্বত্বভোগীদের অনিয়ম নিয়ন্ত্রণ এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও রপ্তানিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং নতুন শ্রমবাজারের দ্বার উন্মোচিত হয়, যা দেশের অর্থনীতিতে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে সাহায্য করে।

সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা :

শ্রমবাজার সংকোচ : ২০২৪ সালে বিদেশে যাওয়া কর্মীর সংখ্যা প্রায় ১.০১ মিলিয়ন, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ২২ % কমেছে। বিশেষ করে গ্লোবাল গন্তব্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোতে (যেমন মালয়েশিয়া, ওমান) কাজের সুযোগ সীমাবদ্ধতা বা বন্ধ থাকার সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। বাজারের এই সংকোচ শ্রম রপ্তানির নির্ভরশীলতা ও প্রবাহে ঝড়ের পূর্বাভাস দিতে পারে।

দুর্নীতি ও নিয়োগ ব্যবস্থায় অনিয়ম : RMMRU-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, দুর্নীতি, অনিয়ম এবং প্রতারণা রপ্তানিলগ্নে একটি বড় বাধা। বেশিরভাগ প্রবাসী শ্রমিক সীমিত গন্তব্যদেশেই (যেমন: সৌদি আরব, কট্টর গাল্ফ দেশ) কাজে যাচ্ছেন, যেখানে নিয়োগ এজেন্সি ও মধ্যস্থদের অবৈধ কার্যকলাপ বেশি।

● প্রতারণামূলক ভিজা অফার ও অতিরিক্ত ফি নিয়ে শ্রমিকদের সমস্যায় পড়ার ঘটনা রয়েছে।

কর্মীদের দক্ষতা ও অংশগ্রহণ কাঠামোর পরিবর্তন : দক্ষ (skilled) শ্রমিকদের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২৪ সালে বেশির ভাগ প্রেরিত শ্রমিক "কম দক্ষ (low-skilled)" হিসেবে ছিল।

প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও রূপান্তরমূলক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অভাব রয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদী রেমিট্যান্স প্রবাহ ও দেশীয় ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

নতুন গন্তব্য ও বাজার বৈচিত্র্যের অভাব

শ্রম রপ্তানি খুব বেশি সংখ্যক দেশে সীমাবদ্ধ : মাত্র ছয়টি গন্তব্যে প্রায় ৯০ % শ্রমিক যাচ্ছে।

নতুন বাজার (বা পূর্বের বাজার পুনরায় চালু করার) ক্ষেত্রে উদ্যোগ কম, এবং সরকারের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অপেক্ষাকৃত সীমিত বা অনুগত নয়। গন্তব্য দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ নীতিমালা পরিবর্তন, কোটা সীমিত হওয়া, বা প্রেরণকারীর নিয়ন্ত্রণ কূটনীতির চাপে আসে।

রেমিট্যান্স থেকে অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি : যদিও রেমিট্যান্স বাড়ছে, এটি কর্মী প্রবাহের সংকোচকে ঢেকে দিচ্ছে। রেমিট্যান্সে নির্ভরতা বাড়ার ফলে দেশের অর্থনীতি প্রবাসী কর্মীর উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে, যা ঝুঁকি সৃষ্টি করে যদি বাজার বা নীতি পরিবর্তন হয়। কিছু ক্ষেত্রে অননুষ্ঠানিক বা অবৈধ রেমিট্যান্স চ্যানেল থাকায়, পুরো প্রবাহই মাত্রা ও নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে পরিমাপ করা যাচ্ছে না।

শ্রম কূটনীতির ভূমিকা এবং প্রস্তাবিত সমাধান : "শ্রম কূটনীতি" বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ও নীতিনির্ধারণের অংশ হিসাবে প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ, বৈধ, এবং লাভজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও সুপারিশ দেওয়া হলো:

বাজার বৈচিত্র্য ও নতুন গন্তব্য উন্মোচন : শ্রম কূটনীতির মাধ্যমে নতুন সম্ভাব্য গন্তব্য (উচ্চ-মেধাসম্পন্ন দেশ, উন্নয়নশীল দেশ, ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র নয় এমন বাজার) অন্বেষণ ও চুক্তি স্থাপন করা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের দূতাবাস এবং শ্রম মন্ত্রকগুলোর মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে প্রতিদিনের কাজ হিসেবে "ওভারসিস এমপ্লয়মেন্ট ডায়লগ প্ল্যাটফর্ম" গঠন করা যেতে পারে, যেখানে নিয়োগকারী দেশগুলোর সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা ও চাহিদা সমন্বয় হবে।

নিয়োগ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করা : মধ্যস্থ এজেন্সি এবং ভিজা প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি রোধে কঠোর বিধি ও নজরদারি প্রয়োজন। নিয়োগ সংস্থাগুলোর লাইসেন্সিং-সিস্টেম রি-ব্যালেন্স করণ এবং তাদের কার্যকলাপ নিয়মিত অডিট করা যেতে পারে। প্রেরণকারী ও গন্তব্য দেশ উভয়েই "বাতিল বা প্রতারণামূলক নিয়োগ বিজ্ঞাপন" প্রতিরোধ করতে কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা উচিত।

কর্মীর দক্ষতা উন্নয়ন : প্রাক-রপ্তান প্রশিক্ষণ (pre-departure training) ও পুনরাবাসন-পরবর্তী কর্মসংস্থান প্রস্তুতির জন্য সরকার এবং বেসরকারী সংস্থার অংশীদারি বাড়ানো দরকার।

প্রযুক্তি-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (যেমন ডিজিটাল দক্ষতা, ভাষা, পেশাগত দক্ষতা) বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক রপ্তানি বর্ধিত করা যায়।

শ্রমিকদের জন্য "সাক্ষরতা ও অবকাঠামোগত সহায়তা" দেওয়া যাতে তারা বৈধভাবে বিদেশে যায় এবং বেশি মূল্যবোধ সম্পন্ন কাজ পায়।

রেমিট্যান্স ব্যবস্থাপনায় কূটনৈতিক নীতিমালা : বাংলাদেশ সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কাজ করতে হবে যাতে রেমিট্যান্স দ্রুত, সাশ্রয়ী ও নিরাপদ চ্যানেলে প্রবাহিত হয়।

কূটনীতি প্রয়োগ করে গন্তব্য দেশগুলোর সঙ্গে "বায়-ডিরেক্ট রেমিট্যান্স চ্যানেলিং" (bilateral remittance channels) বাড়ানো যেতে পারে, যা মধ্যস্থাকারীদের প্রভাব কমাবে এবং খরচ কমাবে।

অবৈধ বা হুন্ডি-নির্ভর রেমিট্যান্স প্রবাহ কমাতে দুনিয়া বাজারে বাংলাদেশের ন্যায্য রেমিট্যান্স নীতির জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানো উচিত।

সামাজিক সুরক্ষা ও শ্রমিক সুরক্ষা কূটনীতি : বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশের শ্রমিকদের জন্য দূতাবাসের "শ্রম সুরক্ষা কনসাল্টেশন সেন্টার" স্থাপন করা যেতে পারে, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বা সংকটপূর্ণ ক্ষেত্রে অবিলম্বে দানে, আইনগত সহায়তা ও পুনরায় কর্মসংস্থানের হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

কূটনৈতিক প্রচেষ্টা দ্বারা গন্তব্য দেশগুলোর শ্রম আইন ও চুক্তি কার্যকরভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে — যেমন, "ম্যাংগ্রোভ চুক্তি" বা "ডুয়েল ব্যাটার্নেন্ট প্রটেকশন অ্যাগ্রিমেন্ট"।

১০. **টীকা লিখুন (যে-কোনো চারটি) :** ৫ × ৪ = ২০

নমুনা উত্তর :

ক. দ্বিজাতি তত্ত্ব : দ্বিজাতি তত্ত্ব হলো একটি রাজনৈতিক মতবাদ, যার মূল দাবি ছিল যে ব্রিটিশ ভারতের হিন্দু ও মুসলিমরা ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দিক থেকে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জাতি।

মূল ভিত্তি: এই তত্ত্বের মূল ভিত্তি হলো এই দুই জাতির মধ্যেকার মৌলিক ও গভীর পার্থক্য, যার কারণে তাদের পক্ষে একই রাষ্ট্রে সহাবস্থান করা সম্ভব নয়।

প্রচারক : মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলিম লীগ অধিবেশনে এটি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন। আল্লামা ইকবাল ও স্যার সৈয়দ আহমদ খানকেও এই ধারণার প্রারম্ভিক চিন্তাবিদ হিসেবে গণ্য করা হয়।

রাজনৈতিক লক্ষ্য: মুসলিমদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ছিল এর চূড়ান্ত লক্ষ্য।

ফলাফল : এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত এবং মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

খ. অপারেশন জ্যাকপট : অপারেশন জ্যাকপট ছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের নৌ-কমান্ডোদের দ্বারা পরিচালিত একটি সফল সামরিক অভিযান। ১৫ আগস্ট রাতে চট্টগ্রাম, মংলা, চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জ বন্দরে একযোগে আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানি নৌপথ ও সামরিক সরঞ্জাম পরিবহনের ব্যবস্থা ধ্বংস করা হয়। এই অভিযানে পাকিস্তান বাহিনীর ২৬টি পণ্যবাহী ও যুদ্ধজাহাজ ডুবে যায়।

গুরুত্ব : অভিযানটি বাংলাদেশের নৌ-কমান্ডো বাহিনীর সাহসিকতা ও দক্ষতার প্রতীক এবং যুদ্ধের গতিপথ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একযোগে সফল এই হামলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় এবং পাকিস্তানের মিথ্যা প্রচারকে দুর্বল করা যায়।

গ. ৩৬ জুলাই : "৩৬ জুলাই" বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে একটি প্রতীকী দিন, যা ২০২৪ সালের ৫ আগস্টকে নির্দেশ করে। এই তারিখটি কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী ও নাগরিক সমাজের অসহযোগ আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত। ২০২৪ সালের জুনে হাইকোর্ট সরকারি চাকরিতে কোটা পুনর্বহালের রায় দেয়, যা আন্দোলনকে তীব্রতর করে। বিভিন্ন শহরে প্রতিবাদ ও সংঘর্ষের পর, আন্দোলনকারীরা তাদের দাবির সঙ্গে ধারাবাহিকতার প্রকাশ হিসেবে ১ আগস্টকে "৩২ জুলাই" থেকে গণনা শুরু করে, যার ধারাবাহিকতায় ৫ আগস্টকে "৩৬ জুলাই" বলা হয়। ওই দিনে ঢাকায় ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান অনুষ্ঠিত হয়, যার ফলে দীর্ঘদিনের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ত্যাগ করেন।

গুরুত্ব : "৩৬ জুলাই" শুধুমাত্র একটি তারিখ নয়; এটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চেতনা, নাগরিক অধিকারের সংগ্রাম এবং অসহযোগ আন্দোলনের শক্তিকে প্রতিফলিত করে। অনেকেই এটিকে দেশের "দ্বিতীয় স্বাধীনতা" হিসেবে বিবেচনা করেন, যা গণসংহতি ও ন্যায়ের প্রতীক হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

ঘ. গণভোট ও বাংলাদেশ : গণভোট (Referendum) হলো জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণে কোনো গুরুত্বপূর্ণ নীতি, আইন বা সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া। এটি গণতন্ত্রের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার, যেখানে জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে নয়, নিজের ভোট দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকে মোট তিনবার গণভোট হয়েছে:

১৯৭৭ – রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতি জনসমর্থন যাচাই (হ্যাঁ ভোট ৯৮.৯%)।

১৯৮৫ – রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নীতি ও পদক্ষেপের প্রতি জনসমর্থন যাচাই (হ্যাঁ ভোট ৯৪.৫%)।

১৯৯১ – সংসদীয় সরকার পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তনের জন্য (হ্যাঁ ভোট ৮৪.৩৮%)।

গণভোটের প্রক্রিয়ায় আইনি ভিত্তি তৈরি, প্রশ্ন নির্ধারণ, নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি, ভোটদান ও ফলাফল ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত। ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে গণভোটের বিধান বাতিল করা হয়েছে, কারণ পূর্বে সামরিক শাসকরা গণভোটকে ক্ষমতা বৈধ করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী, 'জুলাই সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন, ২০২৫' সংক্রান্ত চারটি মূল বিষয়ে জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে একযোগে ভোট নেওয়া হবে, যেখানে জনগণ একটিমাত্র প্রশ্নে 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোট দিয়ে মতামত প্রকাশ করবে।

ঙ. অ্যাটর্নি-জেনারেল : বাংলাদেশ সংবিধান, ধারা ৬৪ অনুযায়ী, অ্যাটর্নি-জেনারেল দেশের প্রধান আইন কর্মকর্তা এবং সরকারকে আইনি পরামর্শ প্রদানের জন্য সুপ্রিম কোর্টে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে এই পদে নিয়োগ দেন। সংবিধান অনুযায়ী অ্যাটর্নি-জেনারেলের দায়িত্ব ও ক্ষমতা হলো:

আইনি পরামর্শ প্রদান : সরকার সংবিধান, সাধারণ আইন, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিষয়ে অ্যাটর্নি-জেনারেলের পরামর্শ নেয়।

প্রধান সরকারি আইনজীবী : সুপ্রিম কোর্টে সরকারের পক্ষে সকল মামলায় তিনি প্রধান আইনজীবী হিসেবে অংশ নেন এবং সরকারের আইনগত স্বার্থ রক্ষা করেন।

আদালতে বক্তব্য প্রদানের অধিকার: সংবিধান তাকে দেশের সকল আদালতে সরকারকে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার প্রদান করেছে।

দায়মুক্তি ও পারিশ্রমিক: রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী অ্যাটর্নি-জেনারেল স্বপদে বহাল থাকেন এবং নির্ধারিত পারিশ্রমিক পান।

নিয়োগ ও মেয়াদ: রাষ্ট্রপতি তাকে নিযুক্ত করেন এবং সন্তোষ অনুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত পদে বহাল রাখা হয়।